কথামৃতে নরেন্দ্রনাথ

কথামৃতে নরেন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম পাই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। তার আগে দক্ষিণেশ্বরে দুবার ঠাকুরের স্পর্শে

প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা
সম্পাদিকা, শিক্ষামন্দির, বারুইপাড়া

তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এক দৈবশক্তিসমৃদ্ধ ও অনুভূতিবান মহাপুরুষ।

শ্রীম-র লেখনীতে সেদিন নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা পাই। ঠাকুরের ঘরে ঢুকে শ্রীম দেখছেন, ঠাকুর উনিশ বছরের একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হয়ে অনেক কথা বলছেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপূর্ণ। চোখ দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা। বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর বলছেন, ''সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?'' নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, ''আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।'' ঠাকুর তাঁকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, ''না রে, অতদূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে। মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়।'' বাঘ নারায়ণ, হাতি নারায়ণ-মাহুত নারায়ণ প্রভৃতি গল্প বলে ঠাকুর বোঝালেন, সাধু-অসাধু, ভালমন্দ সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। গল্পটি নরেন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে; পরে তিনি অনেকবার এটি উল্লেখ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের সম্বন্ধে ভক্তদের বলছেন, ''এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে একরকম।... বাবার কাছে যখন বসে যেমন জুজুটি... এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এরা

কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।”

‘‘বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে।... এত উঁচু যে... ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে... ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচাঁ দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।”—অর্থাৎ নরেন্দ্র সহ ত্যাগী পার্ষদরা এই গোত্রের। তাঁদের সংসার স্পর্শ না করতে করতে তাঁরা ভগবানলাভের পথে এগিয়ে যান।

উপস্থিত ভক্তদের কাছে ঠাকুর নরেন্দ্র সম্বন্ধে প্রায়ই নানা প্রশংসা করতেন। বলতেন, ‘‘দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়—সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচকচ করে কেটে দিতে লাগল।” কখনও বলেছেন, ‘‘ওর ভিতর এতটুকু মেকি নেই বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।”

কথামৃতে প্রথম থেকেই আমরা দেখছি নরেন্দ্রকে বিশেষ সমাদর করছেন ঠাকুর। মাস্টারমশাইকে বলছেন, ‘‘চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়;... যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!”

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রকে বাজিয়ে দেখতেন, নরেন্দ্রও তেমনি প্রতি পদে যাচাই করে নিতেন ঠাকুরের কথা ও কার্যে সামঞ্জস্য আছে কী না। কিন্তু সবক্ষেত্রেই দুজনের আদানপ্রদানের মাধ্যম ছিল একমাত্র ভালবাসা। ঠাকুরকে নরেন্দ্র যে এত পরীক্ষা করেছেন, তাতে কখনও ঠাকুর অসন্তুষ্ট হননি, বরং তাঁর প্রচ্ছন্ন অনুমোদন ছিল, খুশিই হতেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একবার বলেছিলেন, ‘‘ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এ-সমুদ্রে ডুব দিবি কি না বল। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে একখুলি রস রয়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস খাবি বল?” নরেন্দ্র বললেন, ‘‘আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব! কেননা বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব।” তাতে ঠাকুর বললেন, ‘‘বাবা, সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ-সাগর অমৃতের সাগর।... সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও।” এভাবে প্রতিটি কথায়, উপমায় ঠাকুর সঠিক চিন্তাটি শিখিয়ে দিতেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথায় প্রথমাবধি খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ভাষায় : ‘‘আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ-জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা এ-সব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারী ভাবনা হল। একদিন নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল, ‘ওই! ওই!’ আমি বললাম, কি? ও বললে, ‘ওই চাতক! ওই চাতক!’ দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না।” আর একবার, ‘‘আপনি রূপ-টুপ যা দেখেন ও-সব মনের ভুল” —নরেন্দ্রের এই কথা শুনে ঠাকুর সন্দেহ নিবারণের জন্য জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করতে যান। মা তাঁকে বললেন, ‘‘ও-সব সত্য।”

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বিচার করছেন নরেন্দ্র। বলছেন, ‘‘Proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।” শুনে গিরিশচন্দ্র বলছেন, ‘‘তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! হয়তো বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।” এরপর দেবতাদের অমরত্বের কথা উঠলেও নরেন্দ্র প্রমাণ জানতে চান। পল্টু তাঁকে বলেন, ‘‘অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।” ঠাকুর এসব খুব উপভোগ করতেন। সহাস্যে বললেন, ‘‘নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে।”

নরেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করতেন ঠাকুর। বলতেন, ''নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এতো ভক্ত আসছে, ওর মতো একটি নাই।... পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল! অন্যেরা কলসী, ঘটি এ-সব হতে পারে,—নরেন্দ্র জালা। ডোবা, পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি!... মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই... খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ! নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়।''

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছেন হীরানন্দ। তাঁকে ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়ে বলছেন, ''যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।''

কথামৃতে দেখি, নরেন্দ্র এলে শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দের সীমা থাকে না। ১৬ অক্টোবর ১৮৮২। মাস্টারমশাই লিখছেন, ''আজ ঠাকুর... মহানন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন।'' সেদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করলেন। ঠাকুর তাঁর ঘরের মেঝেতে নরেন্দ্রের জন্য বিছানা করতে বললেন। সেই বিছানায় ঠাকুর শিশুর মতো নরেন্দ্রের কাছে বসে মহানন্দে কথা বলতে লাগলেন। নিজের পূর্বাবস্থা গল্পচ্ছলে নরেন্দ্রকে শোনাচ্ছেন। বিকেলে নরেন্দ্র কীর্তন গাইলেন। কিছুক্ষণ কীর্তনের পর নরেন্দ্র খোল ধরে মত্ত হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে গাইছেন—''আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।'' শ্রীরামকৃষ্ণ পরে নরেন্দ্রকে অনেকক্ষণ ধরে বারবার আলিঙ্গন করে বললেন, ''তুমি আমায় আজ যে আনন্দ দিলে!!!''

সেই রাতে ''নরেন্দ্র থাকিবেন; ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই।'' ঠাকুর দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের খাওয়াচ্ছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ। আনন্দের হাট। খাওয়ার পর ঠাকুর নরেন্দ্রকে 'চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে' গানটি গাইতে বললেন। কীর্তন করতে করতে ঠাকুর নৃত্য করছেন। ভক্তেরাও তাঁকে ঘিরে নৃত্য করছেন।

নরেনের উপস্থিতিতে, তাঁর গানে ঠাকুরের আনন্দ। কেবল একবার, ২৫ জুন ১৮৮৪, নরেন্দ্র একতলায় গান গাইছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে নিয়ে দোতলায় ঈশানের বৈঠকখানায় বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, ''আমরা কি অন্যায় করলাম?... নরেন্দ্র নিচে গাচ্ছে—আর আমরা সব পালিয়ে এলাম।'' কেন এমন বললেন? কারণ কথামৃতে অন্যত্র পাই, ''নরেন্দ্র যখন গান গায়; তখন আমার মধ্যে যিনি আছেন—তিনি—সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে—তেমনি স্থির হয়ে শোনেন।''

একদিন ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মাস্টারমশাইকে বললেন, ''যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল—এরা আমার অন্তরঙ্গ। এরা সামান্য নয়।'' তারপরেই জানতে চাইলেন, ''নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?'' মাস্টারমশাইয়ের উত্তর, ''আজ্ঞা, খুব ভাল।'' ঠাকুর তখন নরেন্দ্রের গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন : ''দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায়, আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না—ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।''

ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি সকলের অন্তর-বাহির কাচের মতো দেখতে পেতেন। দেখতেন সত্যনিষ্ঠ নরেন্দ্রের ভিতর-বাহির সমান। এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি নেই। তিনি যেন ঠাকুরের দ্বিতীয় সত্তা। তাই ঠাকুর তাঁকে এত ভালবাসতেন।

একদিন ঠাকুর সস্নেহে নরেন্দ্রকে দেখতে দেখতে বলছেন, ''**বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না।**'' ভাবোন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন—''**কথা বলতে ডরাই,** না বললেও ডরাই/ মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই॥/ আমরা জানি যে মন-তোর, দিলাম তোকে সেই মন্তোর...।'' অর্থাৎ তোকে জীবনের Highest Ideal—সর্বত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার মন্ত্র দিলাম। এক

ভক্ত একথা শুনে বললেন, ''কামিনী-কাঞ্চন যদি ত্যাগ করতে হবে, তবে গৃহস্থ কি করবে?'' শ্রীরামকৃষ্ণের তখন আর কাউকে নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। উত্তর দিলেন, ''তা তুমি কর না! আমাদের অমনি একটা কথা হয়ে গেল।''

ঠাকুরের অপূর্ব ভালবাসা দেখেও নরেন্দ্র কিন্তু তখনও ঠাকুরের সব কথা বিনা বিচারে মেনে নিতেন না। তাই একদিন ঠাকুর যখন জানতে চাইলেন, ''আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে অবতার বলে, তোর কি বোধ হয়?'' সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র নিজস্ব ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, ''অন্যের মত শুনে আমি কিছু করব না। আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখনই বলব।'' বলাই বাহুল্য, নরেনের এমন উত্তরে ঠাকুর খুশিই হতেন।

মহাষ্টমীর দিন ঠাকুর অধরের বাড়ি প্রতিমা দর্শন করতে গেছেন। অনেক ভক্তের মধ্যেও নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুরের আনন্দের সীমা নেই। তাঁকে দেখতে দেখতেই ঠাকুর সমাধিস্থ। নরেন্দ্র মাদুরে উপুড় হয়ে শুয়ে কথা বলছিলেন, হঠাৎ গিয়ে তাঁর পিঠের উপর বসে ঠাকুর সমাধিস্থ! পরদিন সকলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন। বেলা হলে ঠাকুর সকলকে অতিথিশালায় প্রসাদ পেতে পাঠালেন। বললেন, কেবল নরেন্দ্র তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে প্রসাদ পাবেন।

ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করছেন ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫। কীর্তন হচ্ছে। নরেন্দ্র উঠে গেলেন। ঠাকুর বাবুরামকে আস্তে আস্তে বলছেন, ''ঘরে ক্ষীর আছে নরেন্দ্রকে দিগে যা।'' শ্রীম লিখছেন, ''ঠাকুর কি নরেন্দ্রের ভিতর সাক্ষাৎ নারায়ণদর্শন করছিলেন?'' কীর্তন শেষে ঘরে এসে আদর করে নরেন্দ্রকে মিষ্টি খাওয়ালেন। গিরিশকে বলছেন, ''আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি... নরেন্দ্রের উঁচুঘর, অখণ্ডের ঘর।''

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের এই ভালবাসার ছবি কথামৃতের পাতার পর পাতা জুড়ে। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশবাবুর বাড়ি গেছেন। সকলে ঠাকুরের সামনে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছেন। ''ঠাকুর 'নরেন্দ্র' 'নরেন্দ্র' করিয়া পাগল।'' অর্ধেক খাওয়া হয়েছে কী হয়নি, ঠাকুর নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা নিয়ে নরেন্দ্রকে দিয়ে এলেন। বললেন, ''নরেন্দ্র তুই এইটুকু খা।''

কাশীপুরে ঠাকুরকে নরেন্দ্র তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, ''সব্বাই-এর হল, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হল, আমার হবে না?'' ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, ''তুই বাড়ির একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে...।'' নরেন্দ্র সমাধিস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, ''সমাধিলাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।'' নরেন্দ্র বাড়ি গিয়ে পড়তে গেলেন। তাঁর ভাষায় : ''পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল,... বুক আটুপাটু করতে লাগল!—অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই।... বই-টই ফেলে দৌড়!... জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,—গায়েময়ে খড়, আমি দৌড়ুচ্ছি, —কাশীপুরের রাস্তায়।''

ঠাকুর এসব জানার পর বলছেন, ''এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না! এর প্রাণ কিরূপ আটুপাটু হয়েছে দেখছিস।... ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুপাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নাই।'' মাস্টারমশাই লিখছেন, ''ঠাকুরের আজ অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কষ্ট। তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা,—সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।''

নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার অন্ত ছিল না, কারণ তাঁকে তিনি অখণ্ডের ঘর থেকে আহ্বান করে এনেছিলেন জীবের কল্যাণে। জগতের জন্য নরেন্দ্রনাথের 'বিবেকানন্দ' হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্ব দক্ষিণেশ্বরে—যে-পর্বটুকু আমরা কথামৃতে আংশিক দেখতে পেয়ে ধন্য হই।